Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual- Peer Reviewed-Bi-Annual
Digital Research Journal
Website : santiniketansahityapath.org.in
Volume-2 Issue-2 January 2024
ISSN 2583-6706 (Online)

রঙ ও জীবনানন্দের কবিতা

সুকন্যা ঘোষ

Link : https://bit.ly/3Ht31Uy

সারসংক্ষেপ : রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কবিতার আধুনিকতা যাঁর কবিতায় অনুভূত হয় তিনি জীবনানন্দ। চেতন অবচেতনের ধূসর জগতে সুররিয়ালিস্টিক কবির আনাগোনা প্রতিনিয়ত। তার প্রকৃতি মর্ত্যমানবের জীবনচর্যায় কখনো বর্ণোজ্জ্বল, কখনো বর্ণহীন। নীল-সবুজ-কমলা-হলুদ-সোনালী-সাদা-কালো রঙের ক্যানভাসে কবি পাঠকের সম্পর্কসেতু কীভাবে বাঁধা হয় তা এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু।

সূচক শব্দ : সুররিয়ালিস্ট, ক্যানভাস, ফিউচারিস্ট, দিগন্ত, রূপসী বাংলা, ডিঙা, কিশোরী, লক্ষ্মী পেঁচা

জীবনানন্দের 'ঝরা পালক' (১৯২৭), 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' (১৯৩৬), 'বনলতা সেন' (১৯৪২), 'মহাপৃথিবী' (১৯৪৪), 'সাতটি তারার তিমির' (১৯৪৮), 'রূপসী বাংলা' (১৯৫৭), 'বেলা অবেলা কালবেলা' (১৯৬১) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের কবিতায় ছড়িয়ে আছে অজস্র ছবি, যে ছবি কখনো যুগ যন্ত্রণায় ধূসর, আবার কখনো বা প্রেমে, ভালোবাসায়, আদরে, আবেশে রঙিন। জীবনানন্দ সুররিয়ালিস্ট কবি; সমালোচকদের মতে, তিনি কখনো ইম্প্রেশনিস্ট, কখনো ফবিস্ট, আবার কখনো বা ফিউচারিস্টদের মতো রঙকে, গতিকে ব্যবহার করেছেন কবিতার ক্যানভাসে, কিন্তু কোনো পাঠক যদি পাশ্চাত্যের এই শিল্প আন্দোলনগুলো সম্পর্কে অবহিত না হয়, শুধু কবিতা পড়ার আনন্দে কবিতা পড়তে চায়, তাহলেও রঙের বন্যায় বানভাসি সেই পাঠকের মনে হতে পারে, যদি এ কবিতাকে ঢেলে দেওয়া যেত ক্যানভাসে, তবে হয়ত কবিতার ছন্দোবদ্ধ পংক্তিরা সব ডুবে যেত — ভেসে যেত — মিশে যেত ক্যানভাসের বুকে।

জীবনানন্দের কবিতায় নীল আর সবুজ রঙের দেখা মেলে বারবার। এই নীল আর সবুজ কোথাও একে অপরের পরিপূরক, আবার কোথাও বা একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী। আবার কখনো বা শুধু একটি রঙই বদলে গিয়ে নতুন হয়ে ওঠে কবিতা থেকে কবিতান্তরে। 'রূপসী বাংলা'র কবি যখন বলেন—

> মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে
> এমনই হিজল-বট-তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ
> দেখেছিল; (৩ সংখ্যক কবিতা, 'রূপসী বাংলা')

তখন এই 'নীল' স্নিগ্ধতা ছড়ায়। আবার যখন বলেন,

> এখানে আকাশ নীল—নীলাভ আকাশ জুড়ে সজিনার ফুল
> ফুটে থাকে হিম সাদা — রং তার আশ্বিনের আলোর মতন; (৩০ সংখ্যক কবিতা, 'রূপসী বাংলা')

অথবা,

> যতদিন বেঁচে আছি আকাশ চলিয়া গেছে কোথায় আকাশে
> অপরাজিতার মতো নীল হয়ে — আরো নীল — আর নীল হয়ে (৪ সংখ্যক কবিতা, 'রূপসী বাংলা')

তখন এই 'নীল' আকাশের উদার বিস্তৃতিকে প্রতিবিম্বিত করে।

কিন্তু কবি যখন 'কার্তিকের নীল কুয়াশায়' [১৬ সংখ্যক কবিতা, রূপসী বাংলা] ঝরে যেতে চান তখন নীল রঙ মৃত্যুর সমার্থক হয়ে ওঠে। আবার 'বনলতা সেন'এর 'শঙ্খমালা' কবিতায় যখন পড়ি, 'বেতের ফলের মতো নীলাভ ব্যথিত তোমার দুই চোখ' অথবা 'শিঙের মতো বাঁকা নীল চাঁদ শোনে যার স্বর' অথবা 'চোখের তার/যেন শত শতাব্দীর নীল অন্ধকার', তখন এই

নীল রঙে যন্ত্রণার কথা, ব্যথার কথাই পরিস্ফুট হয়।

কবি তাঁর 'নির্জন স্বাক্ষরে' জানান —
রয়েছি সবুজ মাঠে — ঘাসে—
আকাশ ছড়ায় আছে নীল হ'য়ে আকাশে আকাশে;
জীবনের রং তবু ফলানো কি হয়
এই সব ছুঁয়ে জেনে। ('ধূসর পাণ্ডুলিপি')

এখানে আকাশনীল আর মেঠো সবুজ একে অপরের পরিপূরক, দুইয়ে মিশে জীবনকে উজ্জ্বল রঙে ভ'রে দেয়। একই ভাবে 'শিকার' কবিতায় ভোরের বর্ণনাতে কবি নীল আর সবুজকে ব্যবহার করেছেন জীবনকে কুসুমিত করে তোলার জন্য।

ভোর;
আকাশের রঙ ঘাসফড়িঙের দেহের মতো কোমল নীল;
চারিদিকে পেয়ারা ও নোনার গাছ টিয়ার পালকের মতো সবুজ।' ('বনলতা সেন')

ভোরের এই বন্যপ্রকৃতির নীল আর সবুজে মিশে আছে ঘাসফড়িঙের প্রাণের চাঞ্চল্য, পাখির ডানার মতো খুশি, শিহরণ, মুক্তি, জীবন। 'মৃত্যুর আগে' কবিতাতেও 'প্রতিদিন ভোর আসে ধানের গুচ্ছের মতো সবুজ সহজ।' [ধূসর পাণ্ডুলিপি] এই সবুজ ভবিষ্যতের প্রাণসম্ভাবনায়, প্রাণপ্রাচুর্যে পূর্ণ, স্বপ্নে বিভোর।

কিন্তু 'হাওয়ার রাত' কবিতায় যখন পড়ি,
কাল রাতের প্রবল নীল অত্যাচার আমাকে ছিঁড়ে ফেলেছে যেন;
আকাশের বিরামহীন বিস্তীর্ণ ডানার ভিতর
পৃথিবী কীটের মতো মুছে গিয়েছে কাল!
আর উত্তুঙ্গ বাতাস এসেছে আকাশের বুক থেকে নেমে
আমার জানালার ভিতর দিয়ে, সাঁই সাঁই করে,
সিংহের হুঙ্কারে উৎক্ষিপ্ত হরিৎ প্রান্তরের অজস্র জেব্রার মতো!
হৃদয় ভরে গিয়েছে আমার বিস্তীর্ণ ফেল্টের সবুজ ঘাসের গন্ধে,
দিগন্ত-প্লাবিত বলীয়ান রৌদ্রের আঘ্রাণে,
মিলনোন্মত বাঘিনীর গর্জনের মতো অন্ধকারের চঞ্চল বিরাট সজীব রোমশ উচ্ছ্বাসে,
জীবনের দুর্দান্ত নীল মত্ততায়! ('বনলতা সেন')

তখন 'নীল অত্যাচার' বা 'জীবনের দুর্দান্ত নীল মত্ততায়' কামনার-আকাঙ্ক্ষার রঙ অনুভব করি। 'হরিৎ প্রান্তরের' বুকে লাফিয়ে ওঠার অজস্র জেব্রার চিত্রকল্প, 'বিস্তীর্ণ ফেল্টের সবুজ ঘাসের' গন্ধ, 'দিগন্ত প্লাবিত বলীয়ান রৌদ্র', 'বিরাট সজীব রোমশ উচ্ছ্বাসে' চমকিত করে পাঠককে। এই সবুজ প্রান্তর যেন কামনায় উদ্বেল।

অন্যদিকে 'ঘাস' কবিতায়, ভোরের আলোর রঙ লাল, কমলা নয়, সবুজ নরম —
কচি লেবুপাতার মতো নরম সবুজ আলোয়
পৃথিবী ভ'রে গিয়েছে এই ভোরের বেলা;
কাঁচা বাতাবীর মতো সবুজ ঘাস — তেমনি সুঘ্রাণ—
হরিণেরা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নিচ্ছে! ('বনলতা সেন')

এই সবুজ ঘাসের শরীর ছেনে তার ঘ্রাণ 'হরিৎ মদের মতো গেলাসে গেলাসে' পান করতে ইচ্ছে করে কবির। এই হরিৎমদে মাদকতা আছে, জ্বালা নেই। ঘাসের চোখে চোখ ঘসতে ইচ্ছে করে কবির, ইচ্ছে করে ঘাসের ভিতর ঘাস হয়ে জন্মাতে। এই সবুজ ঘাস — সবুজ রঙ যেন মায়ের শরীরের মতো নরম; এ সবুজ প্রান্তরে 'বিরাট, সজীব, রোমশ উচ্ছ্বাস' নেই। আবার 'জলাঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলার'-এ সবুজ করুণ ডাঙায়' [১৫ সংখ্যক কবিতা, 'রূপসী বাংলা'] কবি যখন ফিরে আসতে চান, তখন সবুজ রঙের মধ্যে দিয়ে বাংলার প্রতি কবির মমত্ব প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই একই সনেটে কবি যখন বলেন, 'শামুক গুগলি পড়ে আছে শ্যাওলার মলিন সবুজে' তখন সবুজ তার প্রাণের চাঞ্চল্য, তারুণ্য, ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে গতিহীনতা, মৃত্যুকে প্রতিবিম্বিত করে। 'মৃত্যুর আগে' কবিতায় পড়ি —

খড়ের চালের ছায়া গাঢ় রাতে জ্যোৎস্নার উঠানে পড়িয়াছে
বাতাসে ঝিঁঝির গন্ধ—বৈশাখের প্রান্তরের সবুজ বাতাসে;
নীলাভ নোনার বুকে ঘন রস গাঢ় আকাঙ্ক্ষা নেমে আসে; ('ধূসর পাণ্ডুলিপি')

এখানে 'গাঢ় জ্যোৎস্নার রাত [জ্যোৎস্নার রঙ রূপোলি না ভেবে যদি নীল মনে করা হয়] আর নীলাভ নোনার বুকে নেমে আসা গাঢ় আকাঙ্ক্ষায় ঘনীভূত রস একে অপরকে যেন কম্‌প্লিমেন্ট জানায়; এখানে নীল পরম আকাঙ্ক্ষিত। আবার যখন কবি জানান, 'যত নীল আকাশেরা র'য়ে গেছে খুঁজে ফেরে আরো নীল আকাশের তল' তখন এই নীল অতলস্পর্শী গভীরতার কথা বলে।

নীল আর সবুজ রঙের পাশাপাশি লাল, হলুদ, সোনালী, কমলা, খয়েরী, বাদামী বিভিন্ন রঙ ছড়িয়ে আছে জীবনানন্দের কবিতায়। এই জীবনের কবিতায়, রঙের কবিতায়, পাঠকের শ্রবণ, দর্শন, আশ্বাস নিবিড় ভাবে ডুবে যায় চেতন-অবচেতনের অতল গহনে।

শুধুমাত্র লাল রঙকেই প্রতীকায়িত করেছেন বিভিন্ন অর্থে; যেমন —

ক. কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল-ছায়ায়;
হয়তো বা হাঁস হব — কিশোরীর — ঘুঙুর রহিবে লাল পায়। (১৫ সংখ্যক কবিতা, 'রূপসী বাংলা')

খ. রূপসার ঘোলা জলে হয়তো কিশোর এক সাদা ছেঁড়া পালে
ডিঙা বায়; - রাঙা মেঘ সাঁতরায়ে অন্ধকারে আসিতেছে নীড়ে
দেখিবে ধবল বক : আমারেরি পাবে তুমি ইহাদের ভিড়ে — (ওই)

গ. পর্দায়, গালিচার, রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদ
রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ! (নগ্ন নির্জন হাত, 'বনলতা সেন')

ঘ. সব রাঙা কামনার শিয়রে যে দেয়ালের মতো এসে জাগে
ধূসর মৃত্যুর মুখ। (মৃত্যুর আলো, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি')

ঙ. তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে
পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো সে যে চ'লে গেছে রূপ নিয়ে দূরে; (হায়, চিল, 'বনলতা সেন')

চ. চোখে তার হিজল কাঠের রক্তিম
চিতা জ্বলে : (শঙ্খমালা, 'বনলতা সেন')

ছ. সারারাত মাঠে আগুন জ্বলেছে
মোরগ ফুলের মতো লাল আগুন
শুকনো অশ্বত্থপাতা দুমড়ে এখনো আগুন জ্বলছে তাদের (শিকার, 'বনলতা সেন')

জ. একটা অদ্ভুত শব্দ
নদীর জল মচকা ফুলের পাপড়ির মতো লাল।
আগুন জ্বলল আবার — উষ্ণ লাল হরিণের মাংস তৈরী হয়ে এল। (ওই)

উদ্ধৃত অংশগুলো লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় ঔজ্জ্বল্যে ও ম্লানিমায় লাল রং ভিন্ন থেকে ভিন্নতর অর্থ প্রকাশ করছে। কিশোরীর ঘুঙুর পরা লাল পা কিশোরী শরীরের নম্র, চঞ্চল, লাজুক শিহরণকে গোপন থাকতে দেয় না। আবার 'তরমুজ মদ' যখন 'রক্তিম গেলাসে' পরিবেশিত হয় তখন তা যৌবনের মাদকতা ছড়ায়। এক চুমুক রঙিন মদ ভিজে ঠোঁটে এনে দেয় 'রাঙা কামনার' স্বাদ। 'রাঙা রাজকন্যারা' দূরে চলে যায়, রেখে যায় প্রাপনীয়া, অসূর্যমস্পশ্যা রাঙা সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষিত গল্পকে, কিন্তু শঙ্খমালার চোখে যখন 'হিজল কাঠের রক্তিম চিতা জ্বলে' তখন সেই লাল আগুনে হৃদয় যেন পুড়ে যায়। 'শিকার' কবিতায় 'শুকনো অশ্বত্থপাতা দুমড়ে' জ্বালানো দেশোয়ালীদের আগুন 'মোরগ ফুলের মতো লাল'; এই লাল আগুনে মন জ্বলে যায় না, শীতের রাতে আগুনের ওম্ দিয়ে, জড়তাকে দূরে সরিয়ে দেয় এই লাল আগুন। কিন্তু এ কবিতারই শেষ অংশে ভোরের আলো মাখা অরণ্যে একটা অদ্ভুত বেমানান শব্দ শোনা যায়, তারপরই 'নদীর জল মচকাফুলের পাপড়ির মতো লাল' হয়ে ওঠে। আবার আগুন জ্বলে 'উষ্ণ লাল হরিণের মাংস' তৈরী হয়ে আসে। লাল হয়ে ওঠা নদীর জল রক্তাক্ত, আর্তের যন্ত্রণাকে ধ্বনিত করে। আর উষ্ণ লাল মাংস হৃদয়হীন নির্মম, নিষ্ঠুর মানুষের লোলুপতাকে মূর্ত করে তোলে।

হলুদ রঙকেও কবি ব্যবহার করেছেন বিভিন্নভাবে, 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থের 'কুড়ি বছর আগে' কবিতায় কবি যখন বলেন —

তখন হলুদ নদী
নরম নরম হয় শর কাশ হোগলায় — মাঠের ভিতরে।

তখন এই নরম পেলব হলুদ মনকে আবেশ দেয়, আরাম দেয়। কিন্তু যখন বলেন, 'দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ' — তখন সবুজের বিপ্রতীপে দাঁড়ায় হলুদ — জীবনের বিপ্রতীপে নষ্টজীবনের কথা বলে।

জীবনানন্দ উজ্জ্বল সোনালী রঙকে ব্যবহার করেছেন জীবনের দূরান্বয়ী বিস্তারকে বোঝানোর জন্য। সোনা রোদ মেখে চিল হয়ে ওঠে সোনালী। চিলের বলিষ্ঠ ডানায় ভর করে মর্ত্যপৃথিবীর জীবন উড়ে যায় সোনালী সূর্যের কাছে। এই সোনালী চিল তাই বারবার ফিরে আসে কবিতায় —

ক. সোনালী চিলের বুক উন্মন মেঘের দুপুরে, (সিন্ধুসারস, মহাপৃথিবী)
খ. হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর কেঁদোনাকো উড়ে উড়ে ধানসিড়ি নদীটির পাশে। (হায় চিল, বনলতা সেন)
গ. মিনারের মতো মেঘ সোনালি চিলেরে তার জানালায় ডাক; (মৃত্যুর আগে, ধূসর পাণ্ডুলিপি)

'আট বছর আগের একদিন' আর 'শিকার' কবিতায় সোনালি রঙের রোদ একই অর্থের ব্যঞ্জনা দেয় —

ক. রক্ত ক্লেদ বসা থেকে রৌদ্রে ফের উড়ে যায় মাছি;
সোনালি রোদের ঢেউয়ে উড়ন্ত কীটের খেলা কতো দেখিয়াছি। (আটবছর আগের একদিন, মহাপৃথিবী)
খ. একটা বিস্তীর্ণ উল্লাস পাবার জন্য
এই নীল আকাশের নিচে সূর্যের সোনার বর্শার মতো জেগে উঠে
সাহসে সাধে সৌন্দর্যে হরিণীর পর হরিণীকে চমক লাগিয়ে দেবার জন্য। (শিকার, বনলতা সেন)

'আটবছর আগের একদিন' কবিতার মানুষটি কবির মতো 'সোনালি রোদের ঢেউয়ে উড়ন্ত কীটের খেলা' দেখতে পায়নি, তাই সে লাশকাটা ঘরে শুয়ে হৃদয় জুড়ায়। আর 'শিকার' কবিতার সুন্দর বাদামী হরিণ সেই সোনালী রোদকে অনুভব করেছিল, নতুন দিনের স্বপ্নে বিভোর হয়ে, সোনালী রোদকে বিশ্বাস করে 'সূর্যের সোনার বর্শার মতো জেগে উঠে' তাক লাগিয়ে দিতে চেয়েছিল হরিণীর পর হরিণীকে। যদিও সে মারা পড়েছিল শিকারীর গুলিতে, তবুও উভয় ক্ষেত্রেই সোনালী রোদ বা সোনালি সূর্য জীবনের কথা বলে।

কিন্তু 'সুচেতনা' কবিতার রোদ তার সোনালী ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে ফেলে রূঢ়তাকে প্রকল্প করে, সেই 'রূঢ় রৌদ্রে' ঘুরে কবি ক্লান্ত হন। সোনালী ফসল হয়ে ওঠে 'অগণন মানুষের শব'। মনুষ্যত্বের মৃত্যুতে আহত কবির চৈতন্য বলে —

সেই শস্য অগণন মানুষের শব;
শব থেকে উৎসারিত স্বর্ণের বিস্ময়। (সুচেতনা, বনলতা সেন)

এখানে সোনালী ফসল প্রাচুর্যের কথা বলে না, তা থেকে 'উৎসারিত স্বর্ণের বিস্ময়'এর কথা বলে। স্বার্থান্বেষী বেনিয়াদের ছবি আঁকে।

জীবনানন্দ সাদা রঙকেও ব্যবহার করেছেন নানাভাবে —

ক. কড়ির মতো সাদা মুখ তার,
দুইখান হাত তার হিম; (শঙ্খমালা, বনলতা সেন)
খ. স্তন তার
করুণ শঙ্খের মতো — দুধে আর্দ্র — (ঐ)
গ. কবে যে আসিবে মৃত্যু : বাসমতী চালে ভেজা সাদা হাতখান
রাখো বুকে; হে কিশোরী, গোরোচনা রূপে আমি করিব যে স্নান। (১৬ সংখ্যক কবিতা, রূপসীবাংলা)
ঘ. এখানে আকাশ নীল — নীলাভ আকাশ জুড়ে সজিনার ফুল
ফুটে থাকে হিম সাদা — রং তার আশ্বিনের আলোর মতন। (৩০ সংখ্যক কবিতা, রূপসী বাংলা)

ঙ. এক একবার মনে হচ্ছিল আমার — আধো ঘুমের ভিতর হয়তো—
মাথার উপরে মশারি নেই আমার,
স্বাতী তারার কোল ঘেঁষে নীল হাওয়ার সমুদ্রে সাদা বকের মতো উড়ছে সে। (হাওয়ার রাত, মহাপৃথিবী)

চ. কোথাও কয়েক টুকরো মাছের কাঁটার সফলতার পর
তারপর সাদা মাটির কঙ্কালের ভিতর
নিজের হৃদয়কে নিয়ে মৌমাছির মতো নিমগ্ন হয়ে আছে দেখি; (বেড়াল, বনলতা সেন)

শঙ্খমালার 'কড়ির মতো সাদা মুখ', 'হিম হাত' মৃতের কথা বলে। কিন্তু শঙ্খমালার করুণ শঙ্খের মতো — দুধে আর্দ্র' স্তন থেকে সুস্বাদু প্রাণরসের ধারা নিঃসৃত হয়। একই কবিতা থেকেই নারীর অবয়ব গড়তে একই রঙ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হয় যেন। আবার 'কিশোরীর বাসমতী চালে ভেজা সাদা হাতখান' পরম শান্তির আবেশ আনে। 'কবে যে আসিবে মৃত্যু' একথা বলার পরেও কিশোরীর সাদা হাতখানা বুকে জড়িয়ে ধরে কবি ফিরে তাকান জীবনের দিকে। আবার 'নীলাভ আকাশ জুড়ে' ফুটে থাকা 'সজিনার ফুল হিম সাদা', কিন্তু শঙ্খমালার হিম হাতের মতো নয় তা, তার রঙ 'আশ্বিনের আলোর মতো'। 'হাওয়ার রাত'-এ 'স্বাতী তারার কোল ঘেঁষে নীল হাওয়ার সমুদ্রে সাদা বকের মতো উড়ছে যে' — সাদা বক অবিরত, অনির্দেশ্য চলমানতাকে ফুটিয়ে তোলে। 'বেড়াল' কবিতায় 'সাদা মাটির কঙ্কালের ভিতর' বিড়ালকে 'নিজের হৃদয়কে নিয়ে মৌমাছির মতো নিমগ্ন হয়ে' থাকবে দেখে চমকে উঠি, যে মাটিকে মায়ের সমার্থক বলে চিনি, জীবনরসে পূর্ণ বলে জানি তা এখানে সাদা কঙ্কালের কথা মনে করায় কেন, এই ভেবে।

স্বাভাবিকভাবেই জীবনানন্দের কবিতায় বিশ শতকের প্রথমার্ধের সংশয়াচ্ছন্ন যুগজীবনের চিহ্ন ছড়িয়ে আছে। আর এই সংশয়, যুগযন্ত্রণা, অবিশ্বাস, নীতিহীনতা, মূল্যবোধের ক্রম অবক্ষয় ফুটে উঠেছে অন্ধকার তথা তামসিক রঙের ব্যবহারে। অন্ধকার, কালো, ধূসর রঙের নীচে ঢাকা পড়ে যায়নি আস্তিক্যবোধ; আসলে কবি কালো-অন্ধকারকে পাঠকের চোখের সামনে তুলে ধরে তাকে আলোকপথযাত্রী করে তুলতে চেয়েছেন, বোঝাতে চেয়েছেন আলো আর অন্ধকারের পার্থক্যকে, বোঝাতে চেয়েছেন আলো-অন্ধকারের যৌথযাত্রা মানবজীবনের নিয়তি আর অন্ধকার থেকে আলোর দিকে পদক্ষেপণই মানবজীবনের অন্বিষ্ট।

ধূসর রঙ প্রায়ই মৃত্যুর রূপকে ব্যবহৃত।

ক. সমস্ত মৃত নক্ষত্রেরা কাল জেগে উঠেছিল — আকাশে এক তিল ফাঁক ছিল না;
পৃথিবীর সমস্ত ধূসর প্রিয় মৃতদের মুখও সেই নক্ষত্রের ভিতর দেখেছি আমি (হাওয়ার রাত, মহাপৃথিবী)

খ. দেখিলাম দেহ তার বিমর্ষ পাখির রঙে ভরা
ধূসর পেঁচার মতো ডানা মেলে অঘ্রাণের অন্ধকার। (শঙ্খমালা, বনলতা সেন)

গ. সূর্যের আলোয় তার রঙ কুঙ্কুমের মতো নেই আর
হয়ে গেছে রোগা শালিকের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মত। (শিকার, বনলতা সেন)

ঘ. আরো এক আলো আছে, দেহে তার বিকালবেলার ধূসরতা। (মৃত্যুর আগে, ধূসর পাণ্ডুলিপি)

ঙ. সব রাঙা কামনার শিয়রে সে দেয়ালের মতো এসে জাগে
ধূসর মৃত্যুর মুখ। (ওই)

'ধূসর পেঁচা' মৃত্যুর কথা বলে, লক্ষ্মী পেঁচার মতো সমৃদ্ধি আনে না, 'রোগা শালিকের হৃদয়ের বিবর্ণ' ইচ্ছা-ও অপূর্ণ ইচ্ছার কথা বলে। মৃত্যুর পাশাপাশি ধূসর রঙ বিস্মৃতিকেও প্রতীকায়িত করে। 'নগ্ন নির্জন হাত' কবিতায় কবির 'মনে হয় কোনো বিলুপ্ত নগরীর কথা/সেই নগরীর এক ধূসর প্রাসাদের রূপ জাগে' কবি-হৃদয়ে। এই ধূসর প্রাসাদ ফেলে আসা ধূলিধূসরিত অতীতকে জাগিয়ে তোলে যেন। কোথাও কোথাও কবি বর্ণিত ধূসর আলো অন্ধকারের সমার্থক হয়ে উঠেছে। 'তিমির হননের গান' কবিতায় কবি বলেন —

সেই সব রীতি আজ মৃতের চোখের মতো তবু—
তারার আলোর দিকে চেয়ে নিরালোক।
হেমন্তের প্রান্তরের তারার আলোক। (সাতটি তারার তিমির)

হেমন্তের প্রান্তর ধূসর কুয়াশায় আচ্ছন্ন, তারার আলোকও নিষ্প্রভ, মৃতের চোখের মতো নিভে গেছে জীবনের গল্প। এই 'অন্ধকার রাতে অশ্বত্থের চূড়ায় প্রেমিক চিলপুরুষের শিশির ভেজা চোখের মতো ঝলমল' (হাওয়ার রাত, মহাপৃথিবী) করে না নক্ষত্রেরা,

তিমিরবিলাসী মানুষের নগ্নতায় 'তারার আলোর দিকে চেয়ে নিরালোক' হয়ে যায় কবিমন। অস্থির যুগপটভূমিতে কবির বিশ্বাস ভেঙে যায়। কবি বলেন —'অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ' [অদ্ভুত আঁধার এক]। এই কালো অন্ধকারে পৃথিবী ছেয়ে গেছে। সূর্যের আলো যেন নিভে গেছে; রিরংসা, জিঘাংসার সেবক হয়ে উঠেছে মানুষ। তিমির বিলাসী হতে চান কবি, তিনি জানেন অন্ধকার রানী শাশ্বত, তার পাশাপাশি সূর্যোদয়ও চিরন্তন সত্য। 'আটবছর আগের একদিন' কবিতার আত্মঘাতী পুরুষটি 'বেদনার অবিরাম ভার' বহন করতে পারেনি, তাই যে 'রক্ত ফেনা মাখা মুখে মড়কের ইঁদুরের মতো ঘাড় গুঁজি আঁধার ঘুঁজির বুকে ঘুমায় এবার'। ফাল্গুনের রাতে পঞ্চমীর চাঁদ ডুবে গেলে অদ্ভুত আঁধারে 'মরিবার হলো তার সাধ'। এই অদ্ভুত মর্ষকামী আঁধার শান্তির নামান্তর হয়ে উঠেছিল আত্মঘাতী মানুষটির কাছে। আবার 'শিকার' কবিতার 'সুন্দর বাদামী হরিণ' 'নক্ষত্রহীন মেহগনির মতো অন্ধকার' দেখে ভীত হয়, নিজেকে বাঁচিয়ে চলে সে।

কিন্তু 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থের নামকবিতায় কবি যখন বারবার অন্ধকারের কথা বলেন, তখন অন্ধকার ভিন্নার্থবোধক। অন্ধকারে বনলতাকে দেখেন কবি, বলেন —

হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি দ্বীপের ভিতর
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে,...

এ অন্ধকার সবুজ ঘাসের দেশ, দারুচিনি দ্বীপের মতো, এ অন্ধকারে গেলে দু'দণ্ডের শান্তি; এ অন্ধকার ওম্ ছড়ানো সুগন্ধিত অন্ধকার। বনলতার বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি বলেন, 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা' মনে হয় যেন বহু দূর অতীতের স্মৃতি জমে জমে রূপ পেয়েছে এই অন্ধকার। এ কবিতার শেষ দুই পংক্তিতে কবি অনুভব করেন —

সব পাখি ঘরে আসে — সব নদী — ফুরায় এ জীবনের সব লেন-দেন
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

এই কালো অন্ধকার হাজার বছর ধরে জমে থাকা অভিমানের অভিজ্ঞান। মুখোমুখি বসে থেকেও এ অন্ধকার দুজনের মধ্যে দূরত্ব জাগিয়ে রাখে।

'নগ্ন নির্জন হাত' কবিতায় কবি যখন বিস্মৃত নগরী, ধূসর প্রাসাদের কথা বলেন তখন কোনো রঙের কথা না বলেও শুধুমাত্র কিছু জিনিসের বর্ণনা দিয়েই একটা অদ্ভুত সুন্দর contrast তৈরি করেন। 'মূল্যবান আসবাবে ভরা এক প্রাসাদ/পারস্য গালিচা, কাশ্মিরী শাল, বেরিন তরঙ্গের নিটোল মুক্তা প্রবালে'র উজ্জ্বল উপস্থিতির পরই 'আমার বিলুপ্ত হৃদয়, আমার মৃত চোখ, আমার বিলীন স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষার কথা মনে পড়ে কবির। ঔজ্জ্বল্য আর ধূসরতার এই স্বেচ্ছাকৃত কনট্রাস্টের মধ্যে পাঠকের মনও চেতন-অবচেতনের মধ্যে যাতায়াত করে। এরপরই কবি বলেন 'অনেক কমলা রঙের রোদ ছিল'। এই কমলা রঙ যেন সুখী, নরম, উত্তাপহীন স্নিগ্ধ ঔজ্জ্বল্যকে প্রকাশ করে। আর এই আলো-অন্ধকারের হাত ধরে স্মৃতি-বিস্মৃতির রহস্যময় জগতে পৌঁছে যায় পাঠক, আবার ফিরে ফিরে আসে।

জীবনানন্দের কবিতায় উজ্জ্বল-অনুজ্জ্বল, গাঢ়-হাল্কা, তীব্র-নরম বর্ণের সমাবেশ ঘটেছে সমকালকে, কালপরিবেশের চিত্রকেও রূপ দিতে গিয়ে। সমকাল কবিকে হতাশায়, যন্ত্রণায় ছিঁড়ে-ফেঁড়ে দিয়েছে, ক্লান্ত করে তুলেছে। এরই পাশাপাশি কবির বিশ্বাস, বাংলার নরম সবুজ প্রকৃতির বর্ণনাতেও কবি ব্যবহার করেছেন অজস্র রঙ। তাঁর কবিতার এই চিত্রধর্মিতার ইন্দ্রিয়ঘন আবেদন দেখেই বোধহয় বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন 'ছবি আঁকতে তাঁর নিপুণতা অসাধারণ'। রঙে-রূপে-কথায়-কাহিনিতে জীবনানন্দের কবিতা — জীবনের কবিতা, কবিতার জীবন-জীবনে রঙিন।[১]

তথ্য সূত্র :

১। বুদ্ধদেব বসু, 'কালের পুতুল', পৃ. ৫৪, অপিচ দীপ্তি ত্রিপাঠী, 'আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়', পৃ. ১২৭

গ্রন্থ ঋণ :

১। জীবনানন্দ দাশ, 'বনলতা সেন', সিগনেট প্রেস, কলকাতা ২৩, ৯ম সংস্করণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৭
২।জীবনানন্দ দাশ, 'রূপসী বাংলা', সিগনেট প্রেস, কলকাতা ২৩, ৫ম সংস্করণ ১৩৭৭

৩। জীবনানন্দ দাশ, 'মহাপৃথিবী', সিগনেট প্রেস, কলকাতা ২৩, ১ম সংস্করণ ১৩৭৬
৪। জীবনানন্দ দাশ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', সিগনেট প্রেস, কলকাতা ২৩, ৯ম সংস্করণ ১৪০১
৫। জীবনানন্দ দাশ, 'সাতটি তারার তিমির', অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা ৬০, ৪র্থ মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৯
৬। জীবনানন্দ দাশ, 'বেলা অবেলা কালবেলা', দে'জ, কলকাতা ৭৩, ৪র্থ সংস্করণ ১৩৯৯
৭। দীপ্তি ত্রিপাঠী, 'আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত ১ম সংস্করণ ১৩৮০, পুনর্মুদ্রণ ১৪১৪

লেখক পরিচিতি :

সুকন্যা ঘোষ : স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বাংলায় স্নাতক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ও এম.ফিল উত্তীর্ণ হওয়ার পর প্রবন্ধ রচনা ইত্যাদি ছাড়াও বর্তমানে স্কটিশ চার্চ কলেজে কর্মরত।